জলবায়ু ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের আহ্বান

জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতগণ তাদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার সমর্থন পাওয়ার দাবি রাখে

১. দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্ভাবাস এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা

Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর সকল প্রতিবেদনেই এটা বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে ১৮০-২০০ মিলিয়ন মানুষ বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুত হতে পারে। এসকল বাস্তুচ্যুতি বেশিরভাগই ঘটবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। তাদের এই পূর্বাভাস এখন অনেকটাই বাস্তব, কারণ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন ও ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইতাদির মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গড়ে ২৭ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে *(Internal Displacement Monitoring Center, IDMC-2014).* এর মধ্যে ৮০% এর বেশি ঘটনা ঘটছে এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ, বিশেষ করে ফিলিপাইন, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবেই অত্যন্ত বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে চিহ্নিত। গবেষণায় বলা হয়েছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে আগামী ২১০০ সালের মধ্যে এদেশের ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে *(Accounting Climate Induced Migration in Bangladesh: An Exploratory GIS Based Study, November 2011).* এর অর্থ হচ্ছে, ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ জনে একজন মানুষ বাস্তুচ্যুতির শিকার হতে পারে।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বাস্তুচ্যুতির ঘটনা এক্ষেত্রে সেই আশংকাকে সত্যি করে তুলছে। যেমন, ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে প্রায় ৪০০০ লোকের স্থায়ী এবং বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতি হয়েছে *(Climate Refugee, Michel Nash 2008)*, ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে প্রায় ১.৫০ লাখ মানুষ তাৎক্ষণিক বাস্তুচ্যুত হয়, আর স্থায়ী বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছে প্রায় ১৬,০০০ মানুষ *(Climate Change induced displacement: A case study on cyclone AILA, Hasan Mehedi, 2010)*। এসকল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী এখন পর্যন্ত তাদের পূর্বাবস্থানে ফিরে যেতে পারেনি, কারণ সেখানে অবকাঠামো মেরামত ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি সুবিধা এখনও অপর্যাপ্ত । এর বাইরেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অন্যান্য পরিবেশগত দুর্যোগসমূহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং নদীভাঙ্গন ইত্যাদির কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০-৫০,০০০ মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে *(Climate Change, Loss of Livelihoods and Forced Displacements in Bangladesh, A U Ahmed and S Neelormi, 2008)|*

২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দেশে এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নীতিমালা এবং কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বৈশ্বিকভাবে অনেক বিতর্ক চলছে এবং অনেকটা অযৌক্তিকভাবেই জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর দাবিসমূহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। একথা সত্য যে, বাংলাদেশের মতো অনেক জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশের পক্ষে কোন অবস্থাতেই জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হবে না। কারণ, এসকল দেশের সম্পদ ও সামর্থ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা এবং আশংকা থেকেই আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরছি;

৩. আমাদের দাবিসমূহ

৩.১ জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দাবিসমূহ

ক. *জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনায় জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি আরও কার্যকরভাবে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে*

আমাদের একটি জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP, 2009) রয়েছে, কিন্তু সেখানে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির পরিকল্পনা নাই। যে কারণে বিগত বছরগুলোতে BCCSAP-এর মাধ্যমে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলেও জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সরাসরি কোন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় না। তবে যেহেতু জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে দেখছে, তাই আমরা আশান্বিত যে, সরকার ভবিষ্যতে জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবেন, এবং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে আরও কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে "জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan-NAP)" প্রণয়ন এবং একই সাথে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। আমরা এসকল পরিকল্পনায় জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংযোজনের দাবি করছি।

খ. *সরকারকে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে*

আশংকা করা হচ্ছে যে, অধিক জনসংখ্যার কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পক্ষে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির ঘটনাসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা হয়তো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৯৬৪ জন লোক বাস করে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রতি বর্গকিলোমিটারে

প্রায় ১৫৮০ জন *(বাংলাদেশ জনসংখ্যা গবেষণা এবং পরিসংখ্যান বিভাগ ২০১১)*। এটা হবে বিশ্বের সর্বোচ্চ গড় ঘনত্বের চাইতেও ৩-৪ গুণ বেশি জনসংখ্যার দেশ, কারণ ঐ একই সময়ে ভারতে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব হবে ৩৫০-৪০০ জন এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে হবে মাত্র ২০০-২৫০ জন। এর বাইরে আরও অনেকগুলো বিষয় থাকবে, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা

নিশ্চিতকরণ, বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি, যেগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি মোকাবেলা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে এই উদ্বেগ কার্যকরভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে যদি সরকার একটি "অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" প্রণয়ন করে এবং তার ভিত্তিতে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

অনেক দেশ এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করছে। অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের বর্তমান উদ্বাস্তু নীতিমালা আইন-২০০৭ সংশোধন করছে। একই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ও ভারতে বর্তমান অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। সুতরাং আমরা মনে করি বাংলাদেশকেও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিৎ। এটা করা হলে আমরা পরিমাপ করতে পারবো যে, জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের ব্যবস্থাপনায় আমাদের দক্ষতা ও ঘাটতি কী পর্যায়ে আছে এবং সেক্ষেত্রে কী পরিমাণ আন্তর্জাতিক সহায়তা আমাদের জন্য প্রয়োজন। সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের নীতি চর্চা করা হলে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি নিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক দাবিগুলো উত্থাপন করার নৈতিক বৈধতা থাকবে।

গ. সম্মানের সাথে দেশে-বিদেশে অভিবাসনের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি অনস্বীকার্য

জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রাতিষ্ঠানিক বা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। এটা তাদের জন্য একটা বড় সমস্যা। এ কারণে তারা দেশে ও দেশের বাইরে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এবং জীবন ধারনের সুযোগসমূহ তৈরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। পক্ষান্তরে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বিশেষ করে দক্ষতা ও কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা থাকলে তাদের পক্ষে এ সংকট কাটিয়ে উঠা অনেক সহজ হয় এবং দ্রুত পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে উঠতে পারে। আমরা মনে করি, সরকার প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলের বাইরে এসে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান খুঁজবেন। সেটা হতে পারে তাদের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক শিক্ষা, কারিগরি ও কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা। এর ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী দেশে-বিদেশে তাদের প্রয়োজনে অভিবাসনে সমর্থ হবে এবং তা হবে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন। বিষয়টি বিবেচনায় জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে উপকূলীয় এলাকায় সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়োজিত করার জন্য আমরা নাগরিক সামজের পক্ষ থেকে সুপারিশ করছি। একই সাথে এ ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপকূলীয় এলাকায় সকল নিম্ন মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। কারণ, উপকূলীয় এলাকায় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পরার হার প্রায় ৫০% এবং এই কারিগরি শিক্ষা তাদের ভবিষ্যত কর্মসংস্থান ও জীবন-জীবিকার পথ সহজ করবে।

৩.২ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন সুযোগ ও সম্ভাবনাসমূহ অনুসন্ধান করা যেতে পারে

ক. প্রতিবেশী দেশের মধ্যে আন্ত:সীমান্ত অভিবাসন এবং ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা যেতে পারে

জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে আন্ত:সীমান্ত অভিবাসনের ঘটনা এখন বিশ্বের অনেক দেশেই ঘটছে। আইপিসিসি'র প্রতিবেদনেও তা প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ এটাকে অনেকাংশে নিজেদের নিরাপত্তা ইস্যুর সাথে যুক্ত করছে এবং অনেকটা অযৌক্তিকভাবে নানা বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এর বিপরীত উদাহরণও রয়েছে, যেমন ভারত ও নেপালের মধ্যে ১৯৬৫ সালের প্রণীত বন্ধুত্বমূলক চুক্তি (1965 India-Nepal Friendship Treaty) রয়েছে, যার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে সাধারণ গমনাগমন এমনকি স্থায়ী অভিবাসনও ঘটছে। আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবেশী সকল দেশসমূহের মধ্যে এরকম উদাহরণের চর্চা প্রত্যাশা করছি এবং সেটা সার্ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের দাবি করছি।

খ. আন্ত:সীমান্ত অভিবাসনের ক্ষেত্রে একই ধরনের একটি সাধারণ ব্যবস্থাপনা মান থাকা প্রয়োজন

একথা সত্য যে, জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে আন্ত:সীমান্ত অভিবাসনে সহায়তা দিতে হলে সকল দেশের মধ্যে ঐকমত্য ভিত্তিক একই ধরনের ব্যবস্থাপনা নীতিমালা থাকতে হবে। এর ভিত্তিতে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদেরকে চিহ্নিতকরণ, তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ ও টেকসই অভিবাসন নিশ্চিত হয়। আমরা এ বিষয়ে একটি কর্মকাঠামো প্রণয়নের দাবি করছি যাতে ভবিষ্যতে সর্বসম্মত একই ধরনের ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণীত হওয়ার পথটি সহজ হয়।

গ. জলবায়ু তাড়িত আন্ত:সীমান্ত অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে

জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা মডেল অনেক ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত করতে পারে। সুতরাং বিষয়টিকে অযথা নিরাপত্তার দৃষ্টিতে না দেখে বরং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল হিসেবে দেখা *উচিৎ (The tenuous of Future climate migrants: Manish Vaid and Tridivesh Singh Maini, India 2014)*. যেহেতু ভারত আমাদের বন্ধুদেশ এবং দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার অনেক উদাহরণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা মডেলের কথা ভাবা যেতে পারে এবং কাজ শুরু করতে পারে।

৩.৩ জাতিসংঘ এবং কপ (Conference of the Parties-CoP) প্রক্রিয়ায় আমাদের দাবিসমূহ

ক. জাতিসংঘ এবং কপ প্রক্রিয়ায় উত্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে

জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের জন্য একটি আলাদা আন্তর্জাতিক প্রোটোকল প্রণয়নের দাবি করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন ২০০৯ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, "আসন্ন কোপেন হেগেন সম্মেলন অবশ্যই জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কারণ এসকল বাস্তুচ্যুত জনগণ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাদের ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। উক্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি আহ্বান ছিল যে, জাতিসংঘ জলবায়ু

পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকাঠামো (UNFCCC) এর অধীনে একটি নতুন আইনী কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের আর্থ-সামাজিকভাবে পুনর্বাসন সম্ভব হয় *(সুত্রঃ UN news center at http:// www. un.org/ apps/news/ story. asp?NewsID=32278#.VRecYpPnyBF).*

একইভাবে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (CVC-Climate Vulnerable Forum) উদ্বোধনী অধিবেশনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন " জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং সর্ববৃহৎ প্রভাব হচ্ছে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সৃষ্টি বা Human Migration। বিগত বছরে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বছরে ৪২ মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিশ্বে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতের চাইতে চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগে বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা এখন অনেক বেশি । পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও মরুকরণ এসকল বিষয় এখন বৈশ্বিকভাবে কম গুরুত্ব পাচ্ছে। আমাদেরকে এ ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে আলোচনা শুরু করা উচিৎ এবং কাজ করা উচিৎ, যাতে করে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতিও ব্যবস্থাপনায় একটি সঠিক কর্মকাঠামো তৈরি করতে পারি। *(সুত্র: Inaugural speech from Sheikh Hasina, also see more at http:// daraint .org/2011/11/14/2726/inauguration-of-the-climate-vulnerable-forum-2011/#sthash.YVBVJ51V.dpuf)* ।

এপ্রিল ২০১৪ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত "Global expert meeting on Migration in the post-2015 Development Agenda"তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত বিষয়টিকে ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন আলোচনায় পৃথক আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেন। উক্ত দাবির সমর্থনে তিনি বলেন "বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অবশ্যই উচিৎ জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি বিষয়টি সঠিক গুরুত্ব দিয়ে ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এসকল বাস্তুচ্যুতদেরকে কোন উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে না দেখে বরং মানুষ ও মানবিক বিষয় হিসেবে দেখা। বাংলাদেশের মতো দেশে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের এবং তাদের পরিবারসমূহের জন্য সামাজিক সুরক্ষার চাহিদা এখন ক্রমবর্ধমান, কারণ এটা এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের সুরক্ষা দিচ্ছে, বিশেষ করে জলবায়ু পবির্তনের কারণে যারা উদ্বাস্তু হওয়ার হুমকিতে আছে *(সুত্র: Bengalinews24.com,28 April,2014)*।

কিন্তু হতাশার বিষয় হচ্ছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই দাবি এবং এর পরবর্তী করণীয় বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক (পররাষ্ট্র অথবা বন ও পরিবেশ) কোন প্রকার উদ্যোগ, বিশেষ করে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে কোন দাবিসম্বলিত সুনির্দিষ্ট কাঠামোভিত্তিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন ও আলোচনা আমাদের চোখে পরেনি। সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে দাবি করছি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই সদিচ্ছাকে গুরুত্ব দিবেন এবং আগামী জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনায় উক্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবেন।

খ. ধনী দেশগুলোকে "কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক" এর ভিত্তিতেই জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের সহায়তা করা উচিৎ

উপরোক্ত বিষয়ে কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক-এ "সকল দেশের জন্য সমান কিন্তু দায়িত্ব ভিন্ন (Principal of Common But Different Responsibilities-CBDR)" এই নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই নীতির আলোকে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি, অভিযোজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ধনী দেশগুলোর অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব রয়েছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, "ধনী দেশগুলো জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের পরিকল্পিত স্থানান্তরে, বিশেষ করে জাতীয়ভাবে, আঞ্চলিক এমনকি আন্তর্জাতিক ভাবে যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে সহযোগিতা নিশ্চিত করবে *(কানকুন চুক্তি, ধারা ১৪.এফ)*"। কিন্তু বিগত জলবায়ু সমঝোতা আলোচনায় আমরা এই নীতির প্রতি কোন ধনী দেশের সমর্থন দেখতে পাইনি, যে কারণে বিষয়টি ক্রমান্বয়ে আলোচনা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা এক্ষেত্রে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং দাবি করছি যে, ধনী দেশগুলো জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের অধিকার রক্ষায় তাদের প্রতিশ্রুত দায়-দায়িত্ব স্বীকার করবে এবং সে অনুসারে প্রয়োজনে তাদের জাতীয় নীতিতে (প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো) প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনবে যাতে আর্থিক, কারিগরি এবং ভৌগোলিক সহযোগিতা নিশ্চিত হয়।

গ. জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে মানবিক সংকটের সৃষ্টি করেছে, এমনকি ভবিষ্যতে আরও নতুন কোন আঙ্গিকে মানবাধিকার সংকট সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। যেহেতু জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে বৈশ্বিকভাবে মানবাধিকার বক্ষা করা এবং সেক্ষেত্রে সংস্থাটি অবশ্যই নতুন আইনি কাঠামো প্রনয়নের উদ্যোগ নিতে পারে, কারণ বর্তমান আইনি কাঠামো ও নীতি প্রক্রিয়া এই নতুন সংকট সমাধানে কোন সহযোগিতা করতে পারছে না। জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের ক্ষেত্রে কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং এর নীতি ধনী দেশগুলো স্বীকার করলেও বৈশ্বিক আইনি কাঠামোর দুর্বলতায় তা বাস্তবায়নে হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি। সুতরাং জাতিসংঘের উচিৎ বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ. ধনী দেশগুলোর INDC প্রণয়নে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য করণীয় বিষয়কে সমানভাবে প্রাধান্য দিতে হবে

লিমা খসড়া চুক্তিতে ধনী দেশগুলো কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সকল দেশের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছানুযায়ী অবদান রাখার শর্ত (তথাকথিত INDC Intended Nationally Determined Contribution-INDC) আরোপ করা হয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে ধনী দেশগুলোর একটা কৌশল যেখানে শুধু প্রশমনের প্রতিশ্রুতি থাকবে কিন্তু অভিযোজনের কোন বিষয় থাকবে না। এ ধরনের আরোপিত কৌশল আক্ষরিক অর্থেই অযৌক্তিক এবং অনৈতিক, কারণ এই শর্তটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে ধনী দেশগুলোর দ্বারা। সুতরাং আমরা মনে করি INDC শর্ত সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ এটা শুধুমাত্র প্রশমনের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে আমাদের দাবি হচ্ছে, সকল ধনী দেশকে INDC প্রনয়নে প্রশমন, অভিযোজন এবং অর্থায়নের পাশাপাশি জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট দেশের করণীয় বিষয়সমূহকেও সমানভাবে প্রাধান্য দিতে হবে।

ঙ. জাতিসংঘের উচিৎ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি পৃথক আলোচ্যসূচি হিসেবে উপস্থাপন করা

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের সমস্যাটি আক্ষরিক অর্থেই কোন স্থানীয় সমস্যা নয়, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক মানবিক সংকট। কারণ ধনী দেশগুলোর অব্যাহত কার্বন উদগীরণের কারণে শতবছরের সৃষ্ট নেতিবাচক ফলাফল হচ্ছে আজকের জলবায়ু তাড়িত

বাস্তুচ্যুতি। তাই এর স্থায়ী এবং টেকসই সমাধান করতে হলে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আলোচনায় (কপ আলোচনা) জাতিসংঘকে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের অধিকার বিষয়ক পৃথক আলোচ্যসূচি রাখতে হবে, যাতে করে উক্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গঠন হতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের আরও দাবি হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের বিষয়টিকে "ক্ষয়-ক্ষতি" বিষয়ক আলোচনা থেকে পৃথক করতে হবে। ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক আলোচনা এবং এর সিদ্ধান্তসমূহ অনেকাংশেই অর্থায়ন সম্পর্কিত এবং বাজার প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা অর্থায়ন সম্পর্কিত হলেও এর সাথে ভৌগোলিক ও মানবিক বিষয় যুক্ত রয়েছে, যেগুলো শুধু অর্থের দারা সমাধান সম্ভব নাও হতে পারে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি আর্থিক এবং মানবিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাধান খুঁজতে হবে।

চ. CVF, LDC ইত্যাদি বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশকে তার স্বার্থ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে

আমরা মনে করি, সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে কার্যকর কৌশল ও প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ উপরোক্ত ফোরামগুলো থেকে তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ আদায় করতে পারছে না। বাংলাদেশকে তার স্বার্থসমূহ সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামকে ব্যবহার

করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে LDC (Least Developed Countries) ও CVF (Climate Vulnerable Forum) ফোরামে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে, নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে কাজ করা উচিৎ যা আমরা ফিলিপাইন এবং ভারতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি।

৩.৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের দাবিসমূহ

ক. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি সকল বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-হুমকি হওয়া সত্বেও '২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন আলোচনা'এবং "রিও+২০" এর মতো বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনাসমূহে এ নিয়ে কোন প্রকার আলোচনাও নাই। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের কথা বলছে, অথচ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের বর্তমান চিহ্নিত বাধাসমূহ নিয়ে কোন আলোচনার অবতারণা করতে চাচ্ছে না। আমরা জাতিসংঘের এই দ্বৈত নীতির সমালোচনা করছি এবং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি বিষয়টিকে সকল উন্নয়ন আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

খ. সকল আন্তর্জাতিক নীতি পর্যালোচনা এবং সময়ের চাহিদা অনুসারে হালনাগাদ করা উচিৎ

এটা সত্য যে, জাতিসংঘের প্রণীত সকল নীতিমালাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মানবিক সংকটকে সমাধানের উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছিল, যে কারণে এসকল নীতির অধিকাংশই দরিদ্র, উন্নয়নশীল এবং জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর চাহিদা পূরণে অনেকাংশে সক্ষম হচ্ছে না। তাছাড়া উন্নয়নশীল, দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর দাবি এখনোও প্রাথমিক মানবিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। সুতরাং তাদের দাবিই জাতিসংঘের কাছে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ এবং এসকল দাবিসমূহকে বৈশ্বিক সমর্থন দানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের বর্তমান পশ্চাৎপদ নীতিসমূহকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করছি।

প্রচারাভিযানে অংশ নেওয়া নেটওয়ার্ক এবং সংগঠনসমূহ

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট-সিসিবিডি), বাংলাদেশ ক্লাইমেট জার্নালিস্ট ফোরাম (বিসিজেএফ),ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ), কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি), কাউন্টার ফোটো, কোস্টাল লাইভলিহুড এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লিন), ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিস্ট বাংলাদেশ (এফইজিবি), রূপান্তর-খুলনা, পারটিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (পিআরডিআই) এবং উদয়ন-বাংলাদেশ

সহযোগিতায়: **অক্সফাম**

সচিবালয়: ইকুইটিবিডি, বাড়ী-১৩, রোড-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগ: সৈয়দ আমিনুল হক, মোবাইল +৮৮০১৭১৩৩২৮৮১৫, রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল +৮৮০১৭১১৫২৯৭৯২
ওয়েবসাইট: www.equitybd.org